উপনিষদের নারী

ইয়ুসুফ খান

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে নেপাল আর ভারতের সীমান্তে কপিলাবস্তুতে বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছিল (৫০০ খৃ. পূ.) ইতিহাস বলে তার আগে এই উপমহাদেশে ছিল রামায়ণ মহাভারতের যুগ আর তারও আগে ছিল বৈদিক যুগ। বেদের পরে তার দার্শনিক সারাংশ নিয়ে এল বেদান্ত আর উপনিষদ। উপনিষদগুলি সংখ্যায় অনেক, তার মধ্যে আঠারটি দর্শন হিসেবে বেশি আদৃত।

উপনিষদের ধ্যান ধারণা সনাতন হিন্দু ধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ধরা হলেও যখন তারা সৃষ্টি হয়েছিল তখন কিন্তু হিন্দুত্ব নামে আলাদা কিছু ছিল না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, যম এসব দেবতাদের কথা অবশ্য অনেক কাহিনীর ঘটনাতে আলোচিত আছে, কিন্তু পরম সত্যের অনুসন্ধানের কথা যখনই এসেছে তখন তাঁকে বলা হয়েছে 'অবাঙমানসগোচর', মন এবং বাক্যের উর্ধ্বে জ্যোতির্ময় কোনও অস্তিত্ব। 'বেদাহমেতং পুরুষম মহান্তম আদিত্য বর্ণাম তমসাঃ পরস্তাৎ অর্থাৎ সকল অন্ধকারের পারে সূর্যের মত জ্যোতির্ময় যিনি– সব খোঁজ তাঁর জন্যে। ঈশ্বর এবং পরমাত্মা যিনি, উপনিষদে তার কোনও জাগতিক রূপ কল্পনা নেই। তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডে সর্বত্র ব্যাপ্ত আছেন। বলা হয়েছে আমাদের সবার অস্তিত্বেই অর্থাৎ আত্মায় মিশে আছেন তিনি, তাই তিনি পরমাত্মা আর আমরা 'অমৃতের সন্তান'। 'শৃনন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'– শোন বিশ্বে অমৃতের সন্তানেরা, এই ছিল উপনিষদের আহ্বান।

উপনিষদের ঋষির কাছে সব থেকে বড় খোঁজ আত্মজ্ঞানের। তাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী আত্মায় মিশে থাকা এই পরমাত্মার রূপ আছে রূপের আড়ালে। 'অরূপ বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে– রবীন্দ্রনাথের গান। হিন্দু দর্শনের সারাংশ হিসেবে উপনিষদের চর্চা সারা পৃথিবীতে হয়েছে। বাংলা কবিতাতে আধুনিক ধ্যান ধারণা আনতে আমাদের প্রজন্মের অনেকের জন্যই যিনি গুরুস্থানীয় সেই ইংরাজ কবি টি এস এলিয়ট তাঁর বিখ্যাত কবিতা ওয়েস্টল্যান্ড-এ উপনিষদের উদ্ধৃতি এনেছেন। জার্মান দার্শনিক সোপেনহাওয়ার থেকে আরম্ভ করে আমেরিকার কিংবদন্তি সাহিত্যিক ও দার্শনিক এমারসন অবধি উপনিষদ থেকে নিয়েছেন সবাই। রবীন্দ্রনাথ তো নিয়েছেনই।

দর্শন ছাড়াও এসব কাহিনীতে সেকালের সমাজ ব্যবস্থার কিছু চিত্র পাই আমরা। তেমনই দুটি কাহিনী আছে বৃহদারণ্যক উপনিষদে। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের বিদুষী পত্নী মৈত্রেয়ীর সঙ্গে তাঁর আলোচনা এবং আলোচনা সভায় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বিদুষী রমণী গার্গীর কাহিনী। এই সংখ্যায় শুধু মৈত্রেয়ীর কথাই বলা হল। এই কাহিনী প্রাচীন ভারতে নারীর সামাজিক সম্মান এবং অনেক ক্ষেত্রেই সমান সুযোগের প্রমাণ দেয়।

মৈত্রেয়ীর কাহিনী

পুরাকালে, আজ থেকে অন্তত তিনহাজার বছর আগে, ভারতে এক খ্যাতনামা দার্শনিক ছিলেন তার নাম যাজ্ঞবল্ক্য। যেসব জ্ঞানী মানুষকে ঋষি বলা হত তিনি তাদের একজন ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন ব্রহ্মরাত নামে একজন ব্রহ্মবাদী ঋষি। ঋষি হলেও প্রাচীন ভারতে অল্প বয়সে বৈরাজ্ঞ সাধনের প্রয়োজন ছিল না। প্রথম জীবনে যাজ্ঞবল্ক্য সাধারণ মানুষের মতই সংসারী ছিলেন। তখনকার দিনে জনসংখ্যা কম ছিল। ইচ্ছামত বংশবিস্তারে কোনও অসুবিধা ছিল না। মহাভারতের কাহিনীতে কৌরবদের মা গান্ধারী শত পুত্রের জননী হয়েছিলেন। অত দূরেই বা যাব কেন। মহর্ষিরা জন্মসংখ্যা কম করার চেষ্টা করলে আমরাতো রবীন্দ্রনাথকেই পেতাম না। তিনি নিজেই সপ্তদশতম। বংশবিস্তারে বাধা নেই। সুতরাং সামর্থ থাকলে একাধিক পত্নীও গ্রহণ করতেন প্রাচীনেরা। যাজ্ঞবল্কের দুই স্ত্রী ছিলেন। মৈত্রেয়ী এবং কাত্যায়নী। মৈত্রেয়ী নিজেও খুব বিদূষী মহিলা ছিলেন। সেই হিসেবে 'মঙপুতে রবীন্দ্রনাথ' এবং 'ন হন্যতে'র লেখিকা রবীন্দ্রস্নেহধন্য মৈত্রেয়ী দেবী সার্থকনামা। তুলনায় কাত্যায়নী বেশি করে সংসারী। প্রাকৃতিক নিয়ম। এক জনের অভাব আরেকজন পূরণ করে। শূন্যতা প্রকৃতি চায় না।

যাজ্ঞবল্ক্যের কথায় আসা যাক। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে একটা বয়স পর্যন্ত সংসার করে তার পর সব সম্পত্তি উত্তরাধিকারীর হাতে দিয়ে বানপ্রস্থে যাওয়ার একটা প্রথা ছিল। সবাই যে এমন করতেন তা নয়। কেউ কেউ করতেন। বলা হত 'পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজ'। অবশ্য মাত্র পঞ্চাশে এখন কেউ এমন করে বনে যেতে চাইবে না। তখন মানুষের সাধারণ আয়ু কম ছিল বোধ হয়, সে যুগের ডাক্তার কবিরাজ চরক বা শুশ্রুতের কাছে তো আর এন্টিবায়োটিক ছিল না। বানপ্রস্থ কিন্তু বৃদ্ধাশ্রম নয়। বলা যায় নগরবাস ছেড়ে স্বেচ্ছায় অরণ্যবাস এবং পরম সত্যের সন্ধানে

মনোনিবেশ করা। মনোনিবেশ বা মনোসংযোগ হিন্দু উপাসনার একটা বড় অঙ্গ। ধ্যান করতে হবে চূড়ান্ত একমুখিতায়। কায়মনোবাক্যে বিলীন হতে হবে পরমাত্মার সাধনায়। তবে পাওয়া যাবে কাঙ্ক্ষিত আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান হলে জানা যাবে বিশ্ব রহস্য। যে যাবে সে-ই মুক্ত হবে কিন্তু সেই অবস্থা থেকে ফিরে এসে সব যে বলতে পারবে তা নয়। লবণের পুতুল যেমন সাগর স্নানের গল্প আর এসে বলতে পারে না তেমনি আর কি। ধরে নেওয়া হত সাধারণ জীবনযাত্রা থেকে দূরে অরণ্যের নির্জনতায় বেশি করে মনোনিবেশ সম্ভব। এমন মনস্থ করে যাজ্ঞবল্ক্য তার প্রথমা পত্নী মৈত্রেয়ীকে ডেকে বললেন 'প্রিয়ে, আমি এই সংসার ছেড়ে উচ্চতর সন্ন্যাস আশ্রমে যেতে চাই, এতে তোমাদের অনুমতি থাকলে আমি যাওয়ার আগে আমার জাগতিক সম্পত্তি সব তোমার আর কাত্যায়নীর মধ্যে ভাগ করে দিয়ে যেতে চাই।' মৈত্রেয়ী এত সহজে মানলেন না। প্রশ্ন করলেন, 'হে স্বামী, তুমি যদি আমাকে সমস্ত পৃথিবী এবং তার সব ধনসম্পদ দিয়ে যাও, বলো তাই দিয়ে কি আমি অমৃত লাভ করব 'কথম তেনো অমৃত স্যাম?'
যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর– 'না, তা হবে না। আমি যা দিয়ে যাচ্ছি তাতে তোমরা যতদিন বাঁচবে অন্যান্য সম্পদশালী মানুষের মতো জাগতিক সুখ ভোগ নিয়ে বাঁচতে পারবে, কিন্তু বিত্ত দ্বারা অমৃতত্ব লাভের কোনও আশা নেই।'
মৈত্রেয়ী বললেন, 'যা দিয়ে অমৃত লাভ হবে না সেসব নিয়ে আমি কি করব? 'যেনাহম্‌ অমৃতস্যাম তেনাহম্‌ কিম কুর্যাম?' অমৃতের সাধনায় আপনি যা লাভ করেছেন তাই আমাকে দিন।'
যাজ্ঞবল্ক্য এই কথা শুনে রাগ করলেন না। বরং খুশি হলেন। বললেন– 'মৈত্রেয়ী, তুমি আমার অতি আদরণীয়া পত্নী। তুমি যা বললে তাও আমার মনের মত কথা। তাহলে এসো আমি যা অর্জন করেছি তোমায় বোঝানোর চেষ্টা করি। তুমি মন দিয়ে শোন।
প্রথমেই ভেবে দেখ, আমাদের সব ভালবাসা কিন্তু নিজের অস্তিত্বের জন্য, অস্তিত্বই আত্মা। তাই এই সব কিছু নিজের আত্মার জন্য। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রেমও আসলে স্বামীর জন্য নয়, তার নিজের জন্য, স্ত্রীর প্রতি স্বামীরও তাই। পুত্রের প্রতি পিতামাতার ভালবাসা পিতামাতার আত্মপ্রয়োজনে। এইভাবে সম্পদ, মানুষ, দেবগণ, জীবকুল সমস্ত প্রেমই আসলে নিজের অস্তিত্বের প্রতি, আত্মার প্রতি প্রেম। তার প্রয়োজনেই সব আকর্ষণের সৃষ্টি। তাই আত্মাকে জানলে সব জানা হয়।
যাজ্ঞবল্ক্য বলেই চললেন তার উপলব্ধির কথা। বললেন– 'সে সবকিছুতেই মিশে থাকে অনেকটা লবণের মত, ভেতরে ও বাইরে একই স্বাদ তার। সেই সকল অস্তিত্বের অর্থ। আত্মা অন্তর বাহির শূন্য এবং সর্বাঙ্গে প্রজ্ঞান স্বভাব। তার যে খণ্ডিত রূপ আমরা প্রাণীর মধ্যে দেখি তা ভৌত অস্তিত্বকে আশ্রয় করে। যখন সে নেই তখন অস্তিত্বের নাম নেই, কোনও রূপ নেই।'
মৈত্রেয়ী বললেন 'স্বামী আপনার সব কথা আমি বুঝলাম না। অনেক কিছুই অপরিষ্কার। তিনি না থাকলে অস্তিত্ব থাকবে না কেন?'
যাজ্ঞবল্ক্য এখানে যা বলতে চেয়েছিলেন সেই চেতনার রঙে রাঙানো অস্তিত্ব গভীর এক বোধের কথা। আমরা দেখি বলে গোলাপ লাল আর সমুদ্রের রঙ নীল। কেউ ঘ্রাণ নিলে তাতে ফুলের সুগন্ধ, না হলে লাভ কি গন্ধ ছড়িয়ে? রবীন্দ্রনাথ যেমন লিখেছেন–
'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, আর গোলাপ উঠল রাঙা হয়ে।'
যাজ্ঞবল্ক্য তার দীর্ঘ ভাষণে ধীরে ধীর মৈত্রেয়ীকে তার অনুভূতির এক স্তর থেকে অপর স্তরে নিয়ে যেতে থাকলেন। বললেন–
'প্রিয়ে, এই আত্মা বিকার বিহীন। শরীরের মৃত্যুতে তার বিনাশ হয় না। চেতনার অংশ চেতনায় ফিরে যায়। পরমাত্মা যখন ভিন্ন জীবের মধ্যে আত্মাভাবে বিরাজ করেন, তখন একে অন্যকে দেখেন এবং শোনেন। যখন তিনি নিজ পূর্ণ অসীমে এসে মেলেন তখন আর কোনও দ্বৈত ভাব থাকে না। তখন তিনি কি দেখবেন আর কাকেই বা শুনবেন? যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের সকল কারণের কারণ, তাকে মানুষ আর কি দিয়ে জানবে? এটা নয়, এটা নয় বলে একের পর এক কারণ ত্যাগ করতে করতে শেষে বাক্য ও মনের অগোচর যে চৈতন্য থাকে তাই পরমাত্মা। তিনি অগ্রহণীয় কারণ তিনি গ্রহণীয় হন না, তিনি অক্ষয় কারণ তার কোনও ক্ষয় নেই, তিনি অসঙ্গ কারণ তার কোনও আসক্তি নেই, প্রিয়ে, যিনি সকলের জ্ঞাতা, সেই বিজ্ঞাতাকে কি দিয়ে জানা যায়? সেই চেষ্টাই অমৃতত্ত্বের সাধনা।'
সংক্ষেপে এই ছিল বৃহদারণ্যক উপনিষদে লিপিবদ্ধ মৈত্রেয়ীর প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশ। এর পরে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সেখানে মৈত্রেয়ী শেষ পর্যন্ত সঙ্গী হয়েছিলেন কিনা একথা এই উপনিষদে লেখা নেই। কিন্তু বৈদিক সমাজে যে জ্ঞানকে উন্নত জ্ঞান বলে মানা হত সেই জ্ঞানার্জনে যে তিনি অনেকটা এগিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। উপনিষদের অন্তত দশটি শ্লোক মৈত্রেয়ীর নিজের রচনা। আর কয়েকটা জিনিস এই কাহিনী থেকে বোঝা যায়:
১. প্রাচীন ভারতে মহিলাদের সম্পত্তির পূর্ণ অধিকার ছিল।
২. তাঁরা জ্ঞানার্জন এবং ধর্ম সাধনায় পুরুষের সাথে সমানভাবে অধিকারী ছিলেন।
৩. হিন্দু ধর্মে বিশ্ব প্রকৃতির বিভিন্ন ক্রিয়া-কর্মে বিভিন্ন দেবতার কথা বলা আছে। বৃষ্টির জন্য বরুণ, আগুনের জন্য অগ্নি, তেমনি মৃত্যুলোকের দায়িত্বে যম। জ্ঞান, সংগীত ও সকল শুভ বিদ্যা লাভের জন্য দেবী সরস্বতী। কিন্তু সব কিছুর চালিকাশক্তি যিনি পরমেশ্বর তার নিজের কোনও রূপ কল্পনা নেই। তিনি নিরাকার ব্রহ্ম। অথচ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাকে আশ্রয় করে রূপবান। সব কিছুর মধ্যে তিনি।সৃষ্টিকর্তা বড় একা তাই তাঁকে এইভাবে বহু হতে হয়েছে। বেদান্ত বলে সৃষ্টির প্রারম্ভে তিনি বললেন, 'একমেব বহুস্যাম'। আমি এখন একা, কিন্তু আমি বহু হতে চাই, আর সৃষ্টি হল এই কল্লোলিনী পৃথিবী। যেমন দেখছি আমরা।'
"খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু
সম আনমনে
প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল খেলা,
নিরজনে প্রভু নিরজনে।"
যার যেমন বিশ্বাস। ●

উপনিষদের অন্তত দশটি শ্লোক মৈত্রেয়ীর নিজের রচনা। আর কয়েকটা জিনিস এই কাহিনী থেকে বোঝা যায়: ১. প্রাচীন ভারতে মহিলাদের সম্পত্তির পূর্ণ অধিকার ছিল। ২. তাঁরা জ্ঞানার্জন এবং ধর্ম সাধনায় পুরুষের সাথে সমানভাবে অধিকারী ছিলেন। ৩. হিন্দু ধর্মে বিশ্ব প্রকৃতির বিভিন্ন ক্রিয়া-কর্মে বিভিন্ন দেবতার কথা বলা আছে। বৃষ্টির জন্য বরুণ, আগুনের জন্য অগ্নি, তেমনি মৃত্যুলোকের দায়িত্বে যম। জ্ঞান, সংগীত ও সকল শুভ বিদ্যা লাভের জন্য দেবী সরস্বতী